নাগাল্যান্ডে বাংলা পত্রিকা ও বাংলা চর্চা

দেবাশিস দত্ত

মূল বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রাক্কালে নাগাল্যান্ড সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে বোধ হয়। ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর সেই সময়কার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণান নাগগাল্যান্ডকে ভারতের যোড়শ রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। বৈচিত্র্যে পূর্ণ ন্যাগাল্যান্ডের অনেক ইতিহাস, সে সবের ভেতর প্রবেশ করার অবকাশ এখানে নেই। আমরা এখানে শুধু একটা সাধারণ ধারনা-লাভ করার চেষ্টা করব।

অনেকগুলি উপজাতি নিয়ে নাগাজাতি সমৃদ্ধ। প্রত্যেক উপজাতির ভাষা, সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে কোন মিল নেই। এক উপজাতির ভাষা অন্য উপজাতি বুঝতে পারেন না। ইংলিশ হচ্ছে প্রধান ভাষা, সাধারণ মানুষের মধ্যে 'নাগামিজ' (ভাঙ্গা অসমিয়া ভাষার মিশণে উৎপন্ন ভাষা)- নামে একটি ভাষা প্রচলিত। এই ভাষায় বাংলা হিন্দি ইত্যাদি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর কোন সাহিত্য বা ব্যাকরণ নেই। প্রয়োজনের জন্যে মনে হয় 'নাগামিজে'র সৃষ্টি। বিভিন্ন উপজাতি এবং অ-নাগাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্যই প্রতিবেশী অসমিয়া ভাষাকে কেন্দ্র করে 'নাগামিজে'র উৎপত্তি। নাগাদের মধ্যে ১৫টি প্রধান উপজাতি রয়েছে। সেগুলি হলো— ১। আঙ্গামি, ২। আও, ৩। লোথা, ৪। সুমি, ৫। চাকাসাঙ, ৬। চাঙ, ৭। কন্যাক, ৮। খিয়ামনিয়ানগান, ৯। সাঙখাম, ১০। রেঙমা, ১১। ফোম, ১২। ইয়ামচুঙ্গার, ১৩। ডেলিয়াৎ, ১৪। কুকি, ১৫ পুচুরি।

এঁদের মধ্যে শিক্ষা - রাজনীতি - অর্থনীতি বা অন্যান্যদিকে আঙ্গামী, আও, লোখা, সুমি উপজাতি—অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। ভাষা - বিকাশের ক্ষেত্রে আঙ্গামি, আও, লোথা, সুমিদের ভাষা বিদ্যালয় ও কলেজস্তরে পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে আঙ্গামিদের ভাষা তেনেডি, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও তেনেডির প্রচলন হয়েছে এবং এই ভাষার সাহিত্যও রচিত হচ্ছে। অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাগুলিও তাদের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য সচেষ্ট। নাগা উপজাতিদের মধ্যে অধিকাংশ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর ইংরেজি ভাষা ও পাশচাত্যের আচার - আচরণের প্রভাব খুব বেশী।

১৬,৫৭৯ কিঃমিঃ বেষ্টিত এবং ১৯,৮৮,৬৩৬ জনবসতির রাজ্য নাগাল্যান্ডে ১১টি জেলা রয়েছে। সেগুলি হলো—১। কোহিমা, ২। মোককচঙ, ৩। তুয়েঙসাং, ৪। জুহেবটো, ৫। ওখা, ৬। ফেক, ৭। মন, ৮। ডিমাপুর, ৯। কিফরে, ১০। লঙলেং, ১১। পেরেন। জেলাগুলির জনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য চমকপ্রদ। এক একটি জেলা এক একটি জনজাতি অধ্যুষিত, মোককচঙ জেলা যেমন আওদের, তেমনি কোহিমা আঙ্গামিদের, জুনহেবটো সুমিদের জেলা।

নাগাল্যান্ডে রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর খুব দ্রুতগতিতে শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটেছে। শুধুমাত্র ডিমাপুরেই রয়েছে ১০টি কলেজ, তার মধ্যে ২ টি মহিলা। ডিমাপুরের মতো একটি শহরে এতগুলি কলেজ শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ইঙ্গিতবাহী।

নাগাল্যান্ড থেকেপ্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ঃ চাকুরী ও অন্যান্য বহুবিধ কাজের সূত্রে বর্তমানে প্রায় হাজার ত্রিশ (আনুমানিক) বাঙালি নাগাল্যান্ডে বসবাস করছেন। চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে কিছু সংখ্য বাঙালি পরিবার এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁদের অধিকাংশই ডিমাপুরে নিজেদের ঠিকানা বেছে নেন। পরবর্তীকালে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি নাগাল্যান্ডে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। রাজ্য হিসেবে নাগাল্যান্ড স্বীকৃত হওয়ার পর পাহাড়ের জেলাগুলিতেও অনেক বাঙালি চাকুরী ও অন্যান্যসূত্রে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিত। নাগাল্যান্ডের প্রধান শহর ডিমাপুর। রেলবিমানের যোগাযোগ এবং আরো অনেক সুযোগ - সুবিধার জন্যে এ শহর ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বাঙালির সংখ্যাও দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নাগাল্যান্ডের একমাত্র সমতল বৃহৎ শহর ডিমাপুর। ১৯৫১ সালে কিছুসংখ্যক উদ্যমী বাঙালির প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় ডিমাপুর রেলওয়ে হাইস্কুল। বিদ্যালয়টির পঠন-পাঠনের মাধ্যম ছিল বাংলা, পরবর্তীকালে বাংলা মাধ্যম তার অস্তিত্ব হারায়, বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমেই শিক্ষা - প্রক্রিয়া চলছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে নাগাল্যান্ডে বাংলা মাধ্যমের কোন বিদ্যালয় নেই। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয় ডিমাপুর কলেজ। পাঠ্যবিষয় হিসেবে বাংলা সেখানে ছিল, সেসময় অনেক বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী কলেজে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতেন। ডিমাপুরে শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। শিক্ষার নবউন্মেষের সেই সন্ধিক্ষনে সাহিত্য চর্চার পরিবেশ তখন গড়ে ওঠে নি। বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে স্বপ্ল আয়ু নিয়ে, সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। নাগাল্যান্ড থেকে পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই পটভূমিকার আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে মনে হয়।

নাগাল্যান্ড লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পাহাড়- ঘেরা মোককচঙ জেলার সদর শহর মোককচঙকে স্মরণ করতে হয় ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ ইংরেজি তিনবছর 'সীমান্ত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা মোককচঙ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি ছিল দ্বি-ভাষিক—বাংলা ও অসমিয়া ভাষার 'সীমান্ত' প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই লেখাই বাংলা-রচনায় সমৃদ্ধ। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মোককচঙের সাহিত্য - সংস্কৃতি - সামাজিক জীবনের প্রাণপুরুষ অমরেন্দ্র দত্ত। মোককচঙ প্রসঙ্গ পরবর্তী অংশ নাগাল্যান্ডে বাংলাচর্চা'য় আসবে। সীমান্তকে নাগাল্যান্ডের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। এই পত্রিকা উত্তর পূর্বাঞ্চলের লেখক ছাড়াও বাইরের অনেক প্রখ্যাত লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। সুপরিচিত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিখ আট চরণের একটি কবিতা - 'আশীর্বাণী হয়তো 'সীমান্তে' পাঠিয়েছিলেন। যশস্বী হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ব, কৃষ্ণ ধর, শোভন সোম প্রমুখের লেখা 'সীমান্তে' প্রকাশিত হয়েছে। মনোজ বসু, ডঃ রমা চৌধুরী, বুদ্ধদেব গুহ, নাগাল্যান্ডের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী হোকিসে সেমা, সে সময়ের আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রমুখ অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন 'সীমান্তে'। আনন্দ বাগচি, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অলোক সরকার এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত

লেখকের রচনা সীমান্তে প্রকাশিত হয়েছে বছর তিনেক -এ বিষয়টি আমাদের কাছে গৌরবের ও আনন্দের। প্রাণপ্রাচুর্যে বাঙালি যে সাদা ভরপুর -এ জাতীয় প্রচেষ্টা থেকে তা' প্রমাণিত হয়।

নাগাল্যান্ডের মধ্যে প্রধান শহর ডিমাপুর, এ শহরে বাঙালির সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও পত্র - পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা সে-সময়ে লক্ষ্য করা যায় নি। তার প্রধান কারণ মনে হয়, সে সময় শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক চেতনা— শিক্ষিত মানুষের স্বল্পতা। নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা বা মোককচঙে যেসব বাঙালি ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন চাকুরীজীবী ও শিক্ষিত এবং কিছু সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। এজন্যই ডিমাপুর নয়, প্রথম লিটল ম্যাগাজিন জন্ম নিল মোককচঙে। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, বাঙালির সংখ্যা পাহাড়ে প্রায় শূন্যস্তরে, যা কিছু হচ্ছে তা ডিমাপুরকে কেন্দ্র করেই।

ষাট - সত্তরের দশকে অনেক শিক্ষিত বাঙালি বিভিন্ন কারণে বাইরে থেকে ডিমাপুরে বাস করতে শুরু করেন। সে-সময় 'সংস্কৃতি - পরিষদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ডিমাপুরের শিক্ষিত কিছু ব্যক্তির উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়— 'সংস্কৃতিক পরিষদ' প্রসঙ্গ পরবর্তী আলোচনায় উত্থাপিত হবে। ১৯৭৯ ইংরেজিতে 'সংস্কৃতি পরিষদ' 'অরিত্র' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে। তার সম্পাদনায় ছিলেন প্রয়াত যতীন চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সরকার, দেবাশিস দত্ত, শংকর দেব। স্থানীয় ও বাইরের লেখকদের নিয়ে 'অরিত্র' নামে একটি সম্পূর্ণ লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এ প্রচেষ্টা অংকুরেই শেষ হয়ে যায়। এরপর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ডিমাপুর শাখা থেকে 'সীমান্ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর 'সীমান্ত' ও বন্ধ হয়ে যায় 'সীমান্তে'র সম্পাদনায় ছিলেন অধ্যাপক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, শুভ্রেন্দু চক্রবর্তী এবং আরো দু'এক জন। তারপর দীর্ঘ অনেক বছর বাংলা পত্র - পত্রিকা প্রকাশের কোন উদ্যোগ ছিল না।

এক বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও দায়বদ্ধতা নিয়ে ১লা অক্টোবর, ২০০৩ ইংরেজিতে ডিমাপুর থেকে আত্মপ্রকাশ করে 'পূর্বাদ্রি।' নববর্ষ ও শারদসংখ্যারূপে 'পূর্বাদ্রি' বর্তমান সময় পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য কোন প্রান্তিকতায় আবদ্ধ হ'তে পারে না—এ প্রত্যয় নিষ্ঠ 'পূর্বাদ্রি'র সম্পাদক দেবাশিস দত্ত। এই রচনার লেখক যখন পূর্বাদ্রি'র সম্পাদক সেখানে তার মূল্যায়ন করা এই লেখকের পক্ষে শোভন হবে না। 'পূর্বাদ্রি'র যাত্রা প্রায় একক শক্তির উপর নির্ভর করে শুরু হয়েছিল। সম্পাদক প্রথম যাদের সহায়তা - উৎসাহ পেয়েছিলেন, তারা হলেন—সুব্রত দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, বিষ্ণু ভট্টাচার্য ও বিপ্লব চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে 'পূর্বাদ্রি'র সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন। 'পূর্বাদ্রি' পরিবারে বর্তমান সদস্যরা হলেন— অধ্যাক্ষ জগদীশ চন্দ্র দাস, অধ্যক্ষ হৃদয়রঞ্জন ঘোষরায়, অধ্যাপক প্রবীর দাস, অধ্যাপক প্রণব কুমার রায়, সমীর কুমার সাহা, রামমোহন বাগচি, হরিসাধন আচার্য প্রমুখ। 'পূর্বাদ্রি' নাগাল্যান্ডে বাংলা পত্রিকা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে—সেকথা অকুণ্ঠভাবে বলা চলে। ডিমাপুরে সাহিত্য পরিমণ্ডল প্রায় শূন্য - স্তরে ছিল, 'পূর্বাদ্রি সেই স্তরকে সচল করেছে। 'পূর্বাদ্রি' প্রকাশের সময়কালে ডিমাপুর থেকে হঠাৎ কে আরেকটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ লাভ করে। নাম তার 'মনন।' তবে 'মনন' লিটল ম্যাগাজিনের দায়িত্ব কতটুকু প্রতিপালন করছে—তা' ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ডিমাপুর থেকে উন্নতমানের কিছু স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বিদগ্ধ লেখকদের রচনা সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশ পায়। তার সম্পাদনায় ছিলেন দেবাশিস দত্ত। ডিমাপুর মিউজিক কলেজ থেকেও দু'টি উল্লেখযোগ্য স্মরণিকা প্রকাশিত হয় আবীর চট্টোপাধ্যায় এবং শংকর দেবের সম্পাদনায়। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্মরণিকা ডিমাপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

নাগাল্যান্ডে বাংলা চর্চা ঃ 'বাংলা - চর্চা, শব্দ দু'টির অর্থ ব্যাপক, বাংলা - চর্চার ক্ষেত্রে নাগাল্যান্ডের বাঙালি সমাজ জীবনের সবকিছুই বিধৃত ভাষা অর্থনীতি -শিল্প-সংস্কৃতি-সামাজিক ধর্মীয় অবস্থান সব কিছুই 'বাংলা-চর্চায় অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই ব্যাপক পরিধির মধ্যে প্রবেশ না করে, নাগাল্যান্ডের বাঙালিদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

নাগাল্যান্ডে যদিও আটটি জেলা, বাঙালি জীবনের চাঞ্চল্য মূলতঃ তিনটি জেলাকে কেন্দ্র করে স্পন্দিত।

অন্য জেলাগুলিতে বাঙালির অবস্থান থাকলেও সেখানে সংস্কৃতির কোন চর্চা হয় নি। ডিমাপুর, মোককচঙ ও কোহিমায় বাঙালি জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। এর প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, মোককচঙ বা কোহিমায় যে-সব বাঙালি বাংলা শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতেন, তাঁরা সবাই চাকুরী থেকে অবসৃত হয়ে নাগাল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছেন। একমাত্র ডিমাপুর ছাড়া নাগাল্যান্ডের অন্যান্যস্থানে বাঙালির সংখ্যা অতি নগন্য। আমরা 'বাংলা চর্চা' -প্রসঙ্গটি এই তিনটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

ডিমাপুর ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে ডিমাপুরে বাঙালিরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। বর্তমান সময়ে সমগ্র রাজ্যে-ডিমাপুরে বাঙালির অবস্থা ও অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এখানে আমরা ডিমাপুর বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত রেলওয়ে হাইস্কুলে ও '৬৬ ইংরাজিতে ডিমাপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি পূর্বো আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকমের মানুষজন ডিমাপুরে আসতে শুরু করে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর ডিমাপুর। শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ডিমাপুর কালীবাড়ি। কালীবাড়িতে নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে ডিমাপুর ফ্রেন্ডস্ ক্লাবের জন্ম। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডে ফ্রেন্ডস্ ক্লাব অগ্রণী সংস্থারূপে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে। এখনো ফ্রেন্ডস্ ক্লাবের অস্তিত্ব রয়েছে, তবে অবস্থা ভগ্ন। ২৩শে জানুয়ারী—ফ্রেন্ডস্ ক্লাব বিরাটভাবে প্রতিপালন করত প্রতিবছর। বিশাল শোভাযাত্রা বেরত, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ত। ডিমাপুরে সাংস্কৃতিক জীবনে ফ্রেন্ডস্ ক্লাবের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। ফ্রেন্ডস্ ক্লাব ছাড়াও অন্যান্য ছোট ছোট সংস্থা বা গোষ্ঠি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী ইত্যাদি প্রতিপালিত করত। সে-সময় নাটক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেগুলি হয়েছে, তাদের মান খুব একটা উন্নতমানের ছিল না কঠোর হলেও এ বাস্তব

সত্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৭০-৭১ ইংরাজিতে প্রতিষ্ঠিত হল 'সংস্কৃতি পরিষদ'। এই সংস্কৃতি - পরিষদ শুধু ডিমাপুর নয়, সমগ্র রাজ্যে বাঙালি সংস্কৃতির জগতে একটি গুণগত রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হত। মূলতঃ কয়েকজনকে কেন্দ্র করে 'সংস্কৃতি পরিষদের' যাত্রারম্ভ; তাঁরা হলেন ডঃ মিহিরকুমার বর্মন, দেবাশিস দত্ত, প্রদীপ বসু ঠাকুর, প্রণব কুমার রায়। পরবর্তীকালে আরো অনেক যোগ্য লোক পরিষদে যোগ দেন। সংস্কৃতি পরিষদ প্রথমেই এখানে নিয়ে আসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে-সাথে হৈমন্তী শুক্লা, অমল মুখোপাধ্যায়। তার সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে এখানে সাগর সেন, বাণী ঠাকুর প্রমুখদের অনুষ্ঠান করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির সাথে ডিমাপুরবাসীর প্রথম পরিচয়। ১৯৭৬ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী দু'দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিপালন করে। স্থানীয় 'নামঘর' প্রেক্ষাগৃহে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করা হয়। সংস্কৃতি পরিষদ নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান, গীতি আলেখ্য ইত্যাদি প্রথম ডিমাপুরের কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'দুই বিঘা জমি' নাটক দুটি খুব সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়। এ-কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, ডিমাপুরের সাংস্কৃতিক জীবনের আমূল রুচি পরিবর্তন করেছে সংস্কৃতিক পরিষদ।

১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব বিপুল ও ব্যাপক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ডিমাপুরে প্রতিপালিত হয়। দুদিনের এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা, সেমিনার, স্মরণিকা প্রকাশ, বহিরাগত প্রখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠান এবং আরো অনেক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কবির এই জন্মোৎসব ডিমাপুরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডিমাপুরের সচেতন বাঙালিদের অধিকাংশজনের অংশগ্রহণ একটি অনুষ্ঠানকে উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

১২৫তম রবীন্দ্র জন্মোৎসবের পর ওই অনুষ্ঠান পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী উৎসাহী তরুণদের নিয়ে ১৯৯০ সালে দেবাশিস দত্তের বাড়িতে আহুত এক সভায় প্রতিষ্ঠিত হল 'নান্দনিক।' 'নান্দনিক' এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনে আপন পরিচয়কে বিস্তৃত করে ব্যাপক ভাবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নান্দনিক সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। প্রতিবছর রবীন্দ্র-নজরুল - সুকান্ত জন্মোৎসব উপলক্ষে সংগীত - আবৃত্তি - নৃত্যের এক বিরাট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে নান্দনিক। ডিমাপুর ও বহির্ডিমাপুরে প্রায় শ' পাঁচেক প্রতিযোগী তা'তে অংশ গ্রহণ করেন। দু'দিনের এ অনুষ্ঠান উৎসবের রূপধারণ করে। বর্তমানে অতীতের সেই আন্তরিক দায়বব্ধ প্রচেষ্টা নেই, সে জায়গা অধিকার করেছে ব্যক্তিপ্রচার, বিভেদ, একটি সম্ভাবনাময় সৎপ্রচেষ্টা কলহের রেষারেষিতে এখন প্রায় ম্লান।

ডিমাপুরের বাঙালি জীবনের উল্লেখ্য বিভিন্ন চর্চার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি সংস্থার অবদান রয়েছে। আমরা শুধু প্রণিধানযোগ্য সংস্থাগুলির অবদানের কথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এখানে বাঙালি জীবনে ধর্মীয় চর্চার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে—সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করছি না।

সত্তরের দশকের শেষদিক থেকে ডিমাপুরে সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে এক বেগবান স্রোতের সৃষ্টি হয়। ডিমাপুর বা সমগ্র রাজ্যের ভেতর প্রথম সংগীত শিক্ষা নিকেতন'ডিমাপুর মিউজিক কলেজ।' ১৯৭৮ সালে রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডি. এন. বসুর বাসস্থানে একটি সভা আহুত হয় এবং সেই সভায় শ্রীমতী আরতি রায়ের প্রস্তাবানুযায়ী ডিমাপুর মিউজিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডি। এন. বসু ও শ্রীমতী বসু, আরতি রায়, দীপা ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে ছিল 'মিউজিক কলেজের' প্রথম কান্ডারী। বর্তমানে কলেজটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে, প্রায় শ'চারেক ছাত্র - ছাত্রী সংগীতের বিভিন্ন বিভাগে, নাচে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ডিমাপুরে এ ছাড়াও বর্তমানে ১১টি সংগীত বিদ্যালয় রয়েছে। ডিমাপুর মিউজিক কলেজই এখানে একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যে সংস্থা ব্যক্তি-তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নয়; নির্বাচিত বলিষ্ঠ কর্মটির পরিচালনায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান ডিমাপুর মিউজিক কলেজ।

অন্যান্য সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে ঃ— ১। বিজয়া সংগীত বিদ্যালয়, ২। সুরলোক মিউজিক কলেজ, ৩। মাকালী মিউজিক কলেজ, ৪। সুরসাধনা, ৫। সুরাঞ্জলি মিউজিক ইনস্টিটিউট, ৬। আশা মিউজিক কলেজ, ৭। তারানা, ৮। রিদম্, ৯। তালতরঙ্গ, ১০। কলা নিকেতন, ১১। ললিত পঞ্চম কলা কেন্দ্র।

ডিমাপুরে বাংলাভাষা চর্চা ঃ ডিমাপুর শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বাংলাভাষা পাঠন পঠনের চিত্রটা কী রকম, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করব। সেক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ডিমাপুর রেলওয়ে হাইস্কুলের। ১৯৫১ স্থাপিত এই বিদ্যালয়টিতে পাঠের মাধ্যমে ছিল বাংলা। ডিমাপুরের অনেক কৃতী ছাত্র এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৬৩ সালে রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ধীরে ধীরে বাংলাভাষার গুরুত্বটা কমতে শুরু হয় এবং উন্নতমানের অনেকগুলি ইংলিশমাধ্যম স্কুল স্থাপিত হয়। আশির দশকে নাগাল্যান্ড বোর্ড অব স্কুল এডুকেশনের নির্দেশে। ডিমাপুর লেওয়ে হাই স্কুলের পঠনপাঠনের মাধ্যমে হয়ে যায় ইংলিশ। বাংলাভাষা অবশ্য একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে থেকে যায়। সেই চিত্রটাও ক্রমশঃ তার ঔজ্জ্বল্য হারাতে থাকে, বাংলা বিষয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে শুরু করে। এই অবস্থাটা শুধু ডিমাপুর রেলওয়ে হাইস্কুলের ক্ষেত্রে বাস্তব নয়, এখানে যেসব স্কুল ও কলেজে বাংলা বিষয় পাঠ্য হিসেবে গৃহীত, সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তবে এই গভীর অন্ধকারেও যে আলোকরশ্মি উঁকি মারে, তা' হলো— বাংলাভাষা চর্চার গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় নি এবং ভবিষ্যতেও তা' হবে না।

নাগাল্যন্ড বোর্ড অব্ স্কুল এডুকেশন ও নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নাগাল্যান্ডের বাংলা বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা, উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক স্তরে ছাত্র - ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। কলেজস্তরে ডিমাপুর সরকারী কলেজ, প্রণবানন্দ উইমেন্স কলেজ ও প্রণব বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে অধ্যাপক/অধ্যাপিকা/শিক্ষক রয়েছেন ডিমাপুর পাবলিক কলেজ অব্ কমার্স ও এস. ডি. জৈন মহিলা কলেজ থেকে প্রতিবছর বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র - ছাত্রী বাংলা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এ কলেজ দুটিতে বাংলা বিষয়ের কোন অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা নেই, ছাত্র - ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে বাংলা বিষয় পাঠ্য হিসেবে পড়ছেন ও পরীক্ষা দিচ্ছেন।

প্রণব বিদ্যাপীঠ ও রেলওয়ে হাইস্কুলের ছাত্র - ছাত্রীদের সবাই প্রায় বাঙালি। বাংলা-বিষয় প্রাথমিক শ্রেণি থেকে

বাধ্যতামূলক। অন্বেষণের পর যে তথ্য পাওয়া গেল, তাতে জানা যায় নিজের শ্রেণিগুলিতে বাধ্যতামূলক অন্বেষণের পর যে তথ্য পওয়া গেল, তাতে জানা যায় নিজের শ্রেণিগুলিতে বাংলা বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেক বেশি। রাজ্যের ঐতিহ্যশালী এ দুটি বিদ্যালয় এখন পর্যন্ত বাংলাভাষা চর্চার কেন্দ্রস্থল রূপ পরিগণিত।

বাংলাভাষাচর্চার এই ঘোর দুর্দিনেও নাগাল্যান্ডে বহু ছাত্র - ছাত্রী বাংলা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করেছেন- বিষয়টি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

মোককচঙ ও কোহিমা ঃ পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি ডিমাপুর ছাড়াও মোককচঙ এবং কোহিমায় কিছু কিছু বাংলা চর্চা হয়েছে।

সত্তর ও আশির দশকে মোককচঙে বাংলা সংস্কৃতির একটি গতিশীল ধারা বহমান ছিল। পত্র-পত্রিকা পর্যায়ে ‘সীমান্তের’ বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং মোককচঙে যে অনেক সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তির মিল ঘটেছিল, সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মোককচঙের সে-সময়কার উদ্যমী বাঙালিরা মিলে ‘মোককচঙ ক্লাব’ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পুরোধায় ছিলেন অমরেন্দ্র দত্ত। এই সুদূর পাহাড়ঘেরা শহরে ওরা শেষরক্ষা, মারীচ সংবাদ, স্ফিংস্, পিকনিক, সলিউশন-এক্স, ক্যাপ্টেন হুররা জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করেন। সে সময়ের বাঙালিদের মধ্যে তখন মোককচঙে এক বিপুল উদ্যম ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। যৌথভাবে ওরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ‘মোককচঙ ক্লাব’ ক্রমান্বয়ে এমন শক্তি সঞ্চয় করে, যার ফলে মোককচঙ শহরের শিক্ষিত - বুদ্ধিজীবী নাগারাও এই ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছে ‘মোককচঙ ক্লাব’, একটি ভাল ক্রিকেটদলও এই ক্লাবের ছত্রছায়া সৃষ্টি হয়। অনেক নাগা ব্যক্তি ক্রিকেট দলভুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে নাগা ও বাঙালি —এ দুটি সমাজের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মেলবন্ধন ঘটেছিল। আজ সে-সব প্রায় ইতিহাস।

মোককচঙে ‘এ্যামেচার যাত্রাপটি’ নামে একটি সংস্থা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনেকগুলি যাত্রাপাল সেখানে মঞ্চস্থ করেন। ওই যাত্রাবদলে কোলকাতার যাত্রাশিল্পীদের নিয়ে আসা হয়। যাত্রাভিনয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মিহিরবরণ কর, অন্তম দাস, কালীকেশ বিশ্বাস ও অমরেন্দ্র দত্ত। সেখানে অভিনীত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালাগুলি হচ্ছে গন্ধর্বের মেয়ে, লাল সেলাম, লৌহকপাট ইত্যাদি।

‘বিদেশে বাঙালিমাত্রই সুজন পরিচিত এ বাক্যটির বাস্তব ও সার্থক রূপায়ন ঘটেছিল মোককচঙে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বাঙালিরা পরস্পর পরস্পরের সাথে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, সেখানে গড়ে উঠে এক আনন্দমুখর সমাজ।

কোহিমা নাগাল্যান্ডের রাজধানী, তাই সেখানে নাগাল্যান্ড রাজ্য হওয়ার পর বাইরে থেকে অনেক বাঙালি চাকরী ও অন্যান্য সূত্রে বসবাস করতে শুরু করেন। ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত কোহিমায় নানা রকমের সামাজিক ক্রিয়াকান্ডের চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায়। কোহিমায় দুর্গাবাড়িকে কেন্দ্র করে অনেক নাটক, যাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ‘দুর্গোৎসব - সেকাল ও একাল’ নিবন্ধে জগদীশচন্দ্র দাস লিখছেন ঃ

‘‘সম্ভবত ১৯৫২ সালে কোহিমায় বাঙালিরা মিলে দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। সেটাই বর্তমানে দুর্গাবাড়ী গোড়াপত্তনের শুরু। ৭০-এর দশকে আমরা বাঙালি সরকারী কর্মচারী মাসে মাসে দুর্গাবড়ির জন্য চাঁদা দিতাম। পূজায় পি. ডব্লিউ ডি-র বাঙালিরা অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরে যেত। কয়েকজন কর্মকর্তাই শুধু থেকে যেত। সপ্তমী, অষ্টমীতে বিকেলে ছেলেমেয়েরা নাচগান করত।...”

কোহিমায় সাহিত্যচর্চার বিশেষ প্রচেষ্টার কোন তথ্য এখন পর্যন্ত আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

‘পিপলস্ কালচারাল ফোরাম’ নামে একটি সংস্থা ১৯৯৪ সালে মৈত্রী উৎসব উপলক্ষে ‘মৈত্রী’ নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। সম্পাদনায় ছিলেন শান্তনু ভট্টাচার্য। ইংরেজি বাংলা ও অসমিয়ার বেশ কিছু রচনা সেই স্মরণিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

নাগাল্যান্ড সম্বন্ধেনাগা লেখকদের অনেক প্রামাণ্যগ্রন্থ রয়েছে, অ-নাগা অনেক লেখকেরও অনেক গ্রন্ধে নাগাল্যান্ডের অনেক তথ্য উন্মোচিত করেছে। নাগাল্যান্ডে স্থায়ী অস্থায়ী হাজার হাজার বাঙালি জীবনের উপর আলোকপাত এখনো হয় নি সে ভাবে। এই আলোচনাটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে বলা চলে না। রচনার শেষাংশে অপূর্ণতার বেদনা অনুভব করছি।